হজরত খানবাহাদুর আহ্ছান উল্লা (রঃ) এঁর - দর্শন

‘পত্রযোগাযোগ তত্ত্ব’

চিঠিপত্র মানুষের ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যম। এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হতে পারে। হতে পারে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আবার গোষ্ঠীগত ব্যাপারও। গোষ্ঠীগত যখন সমষ্টিগত হয়ে যায়, তখন তা আর কারও নিজস্ব থাকে না, সবার সম্পত্তি হয়ে যায়। আর তা হয় তখনই, যখন তার সারবস্তু সমাজ অথবা সম্প্রদায়ের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে কাজ করে। আমাদের সাহিত্যে এমনি অনেক চিঠিপত্র আছে। সাহিত্য হলেও এর সবই যে সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত, এমন কোনো ব্যাপার নয়। অসাহিত্যিকদের হাতেও এধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। তবে যাঁরই হাতে তা সৃষ্টি হোক না কেন, চিঠিপত্র লেখার সময় এর লেখকরা কখনই পূর্বাহ্নে ভেবে রাখেনা যে, তাঁর লেখা এসব চিঠিগুলো একদিন সাহিত্য কিংবা কোনো গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের জন্য মূল্যবান সম্পদ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে ‘খানবাহদুর আহ্ছানউল্লা:নির্বাচিত পত্র’ গ্রন্থের সম্পাদক ড. গোলাম মঈনউদ্দিন বলেন, ‘সাহিত্য-কর্মের মধ্য দিয়েই লেখক মূলত পরিচিতি লাভ করেন। লেখক-মূল্যায়ণেও তাই লেখকের সৃষ্টিই সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু লেখকের অন্তর্জগত ও রসলোকের যথার্থ সন্ধান পেতে হলে লেখকের চিঠিপত্র ও অন্যান্য ব্যক্তিগত রচনার দারস্ত হতেই হয়। তাইতো লক্ষ্য করি, লেখকের কোন এক সময়ের অগোছালো চিঠিপত্রও পরবর্তীকালে পত্রসাহিত্য হিসেবে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।’[১] এমনই একজন ব্যক্তিত্ব খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।

বাংলা সাহিত্যে হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর অবদান অনস্বীকার্য। বৈচিত্রময় বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসকল রচনায় তাঁর মেধা, উৎকর্ষ এবং সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন খুজে পাওয়া যায়। কিন্তু তার মানষ-সৌন্দর্য, জীবনদর্শন ও একান্ত বিশ্বাসের সাথে পরিচিত হতে হলে তাঁর চিঠিপত্র বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরী। অধ্যাত্ব ও মনোজগতে তাঁর ছিল অসংখ্য ভক্ত। সেই সব ভক্তরা তাঁর কাছে আসতেন উক্ত বিষয়ক জ্ঞান লাভের আশায়। তাঁর কাছ থেকে শুভ-সত্য পথের দিকনির্দেশনা লাভ করে তাঁরা ধন্য হতেন। যখন সেই সব ভক্তরা তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে অবস্থান করতেন, তাঁদের সাথে তাঁর যোগাযোগ রক্ষিত হতো পত্রযোগাযোগ মাধ্যমে। ভক্তরা তাঁর কাছে চিঠি দিতেন। তিনি জবাব দিতেন সেসব চিঠির। অথবা তিনি নিজেও উপযাচক হয়ে চিঠি দিতেন কাউকে কাউকে। সে সব চিঠি ছিল বিভিন্ন উপদেশপূর্ণ। তাঁর এসব চিঠিগুলো ব্যক্তিগত হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে সর্বজনীনতা লাভ করেছে।

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করেন। আর এই দীর্ঘ জীবনে তিনি প্রায় নিয়মিতভাবে তাঁর ভক্ত, বন্ধু ও অনুসারীদের সাথে পত্র যোগাযোগ করেন। ভক্তদের কাছে তাঁর লেখা এ ধরনের চিঠির সংখ্যা অসংখ্য। যেখান থেকে এ পর্যন্ত ১৭৫৩টি পত্র নিয়ে ‘ভক্তের পত্র’ ‘প্রেমিকের পত্রাবলী’ ‘ইরশাদে মুরশীদ’ ‘অমিয় বাণী’ ও ‘অপ্রকাশিত পত্রাবলী’ নামে মোট ৫টি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। ‘ভক্তের পত্র’ ও ‘প্রেমিকের পত্রাবলী’ সংকলন দু’টি প্রকাশিত হয় তাঁর জীবদ্দশায় তাঁরই সংকলনে। আর অপর সংকলনগুলা প্রকাশিত হয় তাঁর ইন্তেকালের পর। ‘খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : নির্বাচিত পত্র’ গ্রন্থের সম্পাদক ড. গোলাম মঈনউদ্দিন উক্ত সংকলনগুলো সম্পর্কে বলেন, ‘ভক্তের পত্র’ হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর সর্বোৎকৃষ্ট পত্র সংকলন। এখানে সংকলিত পত্রগুলি যেন ঐশী প্রেমের প্রতিচ্ছবি। কর্মব্যস্ত জীবনের ক্ষণকালের অবসরে, কাছে বা দূরের সফরে, স্বল্পকালীন যাত্রাবিরতিতে, কার্যোপলক্ষে নির্ধারিত কোথাও অবস্থানকালে কিংবা সরকারি চাকরিত্তোর অবসর জীবনে লেখক তাঁর মনোভাব ও নানা মাত্রিক উপলব্ধির স্বাক্ষর রেখেছেন ‘ভক্তের পত্র’ গ্রন্থের বিভিন্ন পত্রে।---- ‘প্রেমিকের পত্রাবলীকে’ ভক্তের পত্রের সম্প্রসারিত ভাবের প্রতিফলন বলা যায়। ‘ভক্তের পত্রে’ লেখকের মনোভাবনার যে রূপ ও বৈচিত্র, অধ্যাত্ম প্রেমের যে নিগূঢ় অনুভূতি এবং ধার্মিকতার যে প্রকৃষ্ট উদাহরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে তারই আলোকে ‘প্রেমিকের পত্রাবলীকে’ সাজানো হয়েছে। ---‘ইরশাদে মুরশীদ’ মূলত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হককে লেখা হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর পত্রাবলীর একটি শোভন সংকলন। ১৯৮৪ সালে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। --কীভাবে একটি জীবন ও একটি পরিবার পর্যায়ক্রমে একজন অধ্যাত্ম জীবনচারির সযত্ন

লালিত অনুরাগের ছোয়ায় লালিত-পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হতে পারে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'ইরশাদে মুরশীদ'। বিশিষ্ট সমাজ-মনস্ক, আহ্ছানিয়া মিশনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ও সংস্কৃতি-সচেতন ব্যক্তিত্ব নজীর আহমদকে লেখা হয়রত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর পত্রাবলীর আর একটি সংকলন 'অমিয়বাণী'। ---প্রথম প্রকাশকাল ১৯৯২। ---কাছে বা দূরের বহু ভক্ত ও অনুসারীর কাছে লেখা হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর কিছু পত্রাবলী নিয়ে সাজানো হয়েছে 'অপ্রকাশিত পত্রাবলী'। এটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী'র ১২তম খন্ডে।'[২]

'মানুষ বড় ভয়ানক জীব; এরা ভালবাসিতে দেয় না, এরা হিংসা ব্যতীত জানে না, এরা পরশ্রীকাতর, সন্দেহই এদের একমাত্র খোরাক, আমিত্ব ইহাদের একমাত্র সম্বল, ইহারা জাহেরকে পূজা করে, বাতেনকে উরাইয়া দেয়, পঞ্চেন্দ্রিয় ইহাদের জ্ঞানের একমাত্র দ্বার, বড়াই ও অভিমানে এরা পুষ্ট।' [৩] এক ভক্তকে লেখা পত্রে মানুষ সম্পর্কে এভাবে বলার পরও তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। তিনি মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন এবং পরস্পরকে ভালোবাসতে বলেছেন, লিখেছেন অসংখ্য পত্র। পত্রযোগাযোগকে তিনি মানুষ তৈরীর মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন।

মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি খোদাপ্রাপ্তি। আর স্রষ্টার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করা তাঁকে পাওয়ার শ্রেষ্ঠতম পথ। ইসলামে সুফীদর্শনের মূলকথা এটাই। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর ভক্তকে লেখা এক পত্রে বলেন, 'খোদাতা'লার মহব্বত ও তাঁহার পেয়ারা নবীর মহব্বত হাছেল করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ... মহব্বত খোদাতা'লার খাস দান। ইহার ন্যায় মূল্যবান বস্তু নাই, আমিত্ব না ঘুচিলে ইহা লাভ করা যায় না প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া একোদ্দিষ্ট চিন্তা করিতে পারিলে মহব্বত লাভ হয়। খোদাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই।'[৪]

নবী প্রেমে নিমজ্জিত হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সারাটি জীবন তাঁর ভক্ত-অনুসারীকে ফাতেহা দোয়াজদহম ও মিলাদ মাহফিলে যোগদান/অংশগ্রহণের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এক ভক্তকে লেখা পত্রে তিনি বলেন, 'আগামী ফাতেহা দোয়াজদহম শরীফ ক্রমে নিকটবর্তী হইতেছে। এখন হইতে প্রস্তুত থাকিবেন এবং বন্ধু-বান্ধবগণসহ যথাসময়ে যোগদান করিয়া মহফেলের শোভা বর্ধন করিবেন।'[৫] অন্য এক ভক্তকে লেখেন, 'মিলাদ শরীফে ভক্তির সহিত যোগদান করিবে। --দরূদ শরীফ স্বর্গের সিঁড়ি, দুন্ইয়া ও আখেরাতের সংযোজক বস্তু। ইহারই দ্বারা দুন্ইয়াবী বেড়া সহজে পার হইতে পারিবে।'[৬]

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর ভক্ত অনুসারীকে লেখা অনেক পত্রে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আচার অনুষ্ঠান পরিপালন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন এবং অধ্যাত্ম সাধনার বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি মুসলমান আর ইসলাম'র যথার্থ পরিচয় দিতে গিয়ে ভক্তকে লেখা এক পত্রে বলেন, 'কেবল দাড়ি রাখলে, লম্বা তছবী নিলে, টুপী পরলে আর কুলুখ নিলে মোছলমান হয় না। .. ইছলাম কেবল কুলুখে আর গোফ দাড়িতে সীমাবদ্ধ নহে। ইছলাম বলতে আত্মসমর্পণ বুঝায়, ইছলাম বলতে তছদিক বা অনুভূতি বুঝায়। পাঁচবার ড্রিল করায় ইছলামের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। খোদার সহিত যার যোগাযোগ নাই, সে আবার মোছলেম কিসের?'[৭]

ইসলাম ধর্মের পাঁচটি রোকনের মধ্যে নামাজ অন্যতম। যার মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভ হয়। কিন্তু খোদার নৈকট্য লাভের এই নামাজ কিভাবে আদায় করলে সুফল পাওয়া যায় হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তার বিধি সম্পর্কে লিখেছেন বিভিন্ন পত্রে। যেমন-'নামাজে দাঁড়াইয়া মহাপ্রভুর সহিত মনের ভাব আদান-প্রদান করিবে, অতীত কথা মনে করিয়া খুব রোদন করিবে, ক্ষমা ভিক্ষা করিবে, নিজের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞাপন করিবে, আপনাকে তাঁহারই হাতে সমর্পণ করিবে, তবেই তাঁহার দয়ার পরিচয় পাইবে।'[৮] একইভাবে 'রোজা ও ইত্তেকাফ' 'তাহাজ্জদ ও অন্যান্য নফল নামাজ' 'মোরাকাবা' 'কোরআন তেলওয়াত, 'ঈদের নামাজ ও কোরবানী' 'শবে বরাত ও শবে কদর' 'শবে-জুমা' প্রমুখ সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ উল্লেখিত আছে বিভিন্ন পত্রে।

জগত সংসার সংলগ্ন মানব জীবন নফ্সের প্রভাব মুক্ত/বহির্ভূত নয়। নফ্ছ জীবনচরিত্রের সার্বিক ক্ষতি সাধন করে। তাইতো খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্রে ভক্ত ও অনুসারীকে নফ্স দমনের শিক্ষা দিয়েছেন। নফ্সের দমন প্রসঙ্গে ভক্তকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন, 'প্রথমে মনকে পবিত্র করো, ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে নফ্সের গলায় রশি বাঁধো। কেবল উদরের রোজা করো না, চোখের রোজা, হাতের রোজা, কানের রোজা, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রতঙ্গের রোজা করবে। কুদৃষ্টি করবে না, হাত পায়ের অপব্যবহার করবে না, কুকথা শুনবে না, বদ গন্ধ নিবে না, অতিরিক্ত ক্রোধ বা লোভ করবে না, গীবত, চোগলখুরি ও অভিমান হইতে বাজ থাকবে।'[৯]

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) মনে করেন, 'সকল জাতির একই স্রষ্টা, সকল দেশের একই উপাস্য, সকল কালের একই ধ্যেয়।'[১০] পীর হিসেবে তিনি সেই পরম স্রস্টার সাথে ভক্ত-অনুসারীর যোগসুত্র সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য আমৃত্যু চেষ্টা করেন। পীর বা ধর্মগুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি এক হিন্দু ভক্তকে লেখেন, 'আপনি যদি নিরাকার উপাসনায় মনকে Concntrate করিতে না পারেন, তবে গুরুর স্মৃতি নিয়ে ধ্যানে বসিবেন। কিন্তু লক্ষ্য থাকিবে ভগবান, গুরু নয়। গুরুর সহিত যদি ভগবানের নিকট সম্পর্ক থাকে তবে তাহারই মধ্যবার্ত্তায় ভগবানকে পেতে পারেন, কিন্তু অযোগ্য হইলে ভগবানের সহিত যোগসাধন কষ্টসাধ্য হবে।'[১১]

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) মনে করেন 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত'। রয়েছে ইহকাল ও পরকালের অনেক প্রাপ্তিযোগ। তাইতো ভক্তকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন 'মাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পিতার আদেশ অনুসরণ করিয়া স্বীয় কর্তব্যে ব্রতী থাক।'[১২] কিন্তু অনেকেই নিজের মাকে অনাদর করে স্ত্রীর প্রতি বেশি দায়িত্বশীল হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে তিনি অন্য এক ভক্তকে লেখেন, 'স্ত্রীর জন্য বাড়ীতে যাইবে না। যে পর্য্যন্ত মাতৃভক্তি গালেব না হয়, সে পর্য্যন্ত বাড়ীর নাম লইবে না। মাতৃ-সেবাকে স্ত্রী-সেবা অপেক্ষা উচ্চতর মনে করিবে পাশবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিবে। স্ত্রীর উপযোগী হইতে চেষ্টা করিবে। স্ত্রীকে খোদার দান বলিয়া তাকে সাচ্চআয়ীর সহিত দেখিবে, তার মধ্যেও মাতৃভাব বিরাজমান আছে জানিবে।'[১৩]

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর চাকরিজীবী ভক্তদের সততার সাথে সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করা, চাতুর্যের আশ্রয় না নেয়া, লোভকে সম্বরণ করা, ঘুষ খেতে নিষেধ করা, মিথ্যার আশ্রয় না নেয়া, অশুভ প্রভাব থেকে দূরে থাকা, হালাল খাওয়া, মিতব্যয়ী হওয়া, ধর্মপরায়ণ হওয়া, খোদাকে ভয় করা ইত্যাদির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি ভক্তকে লেখা এক পত্রে বলেন 'চাকর হয়ে মনিবকে সন্তুষ্ট করাই চাকরির উদ্দেশ্য। যে মনিবকে সন্তুষ্ট করতে পারে সে বড় মনিবকেও সন্তুষ্ট করে। কর্তব্য কর্তব্যই, যারই প্রাপ্য হউক না কেন।'[১৪]

দুঃখ,কষ্ট, দারিদ্র্য, জরা, ব্যাধি, ভাগ্যবিপর্যয়, স্বজন হারানোর বেদনা ইত্যাদি এসব তো মানব জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এমন পরিস্থিতিতে হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর ভক্ত-অনুসারীদের পত্র মারফত সান্তনা প্রদান/উজ্জীবিত করেন। তিনি মনে করেন, এমন ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষের নিয়ত পরীক্ষা হয়। দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদের মধ্যেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল নিহিত থাকে। বিষয়টি বুঝানোর জন্য ভক্তকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন, 'যখন সংসারে আসিয়াছ, তখন দুঃখ যন্ত্রণাকে ভয় করিলে চলিবে না। কেবল সহিয়া যাও, নির্ব্বাক হইয়া দয়াময়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে থাক।'[১৫] অন্য এক ভক্তকে লেখা পত্রে বলেন, 'মা, ব্যাধি দেখে ভয় পেয়ো না। স্বাস্থ্য ও ব্যাধি ঐরূপ, যেরূপ আলোক ও আধার। উভয়ই খোদার দান, তারা যমজ সন্তান স্বরূপ। একটী না হলে অপরটির বাহবা হ'তো না।'[১৬]

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) মৃত্যুকে কখনো ভয় পাননি, বরং মহানন্দলোকে প্রবেশের উপলক্ষ হিসেবে দেখেছেন। তিনি নিজ জীবদ্দশায় পুত্রদের মৃত্যুশোক সহ্য করেছেন, কখনও 'উঃ' শব্দটি করেননি। তদ্রুপ মৃত্যু-শোকে কাতর ভক্তদের তিনি শান্তনা দিয়েছেন ও ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন পত্রযোগাযোগের

মাধ্যমে। মায়ের মৃত্যুতে শোকাতুর এক ভক্তকে লেখা পত্রে তিনি বলেন, 'পিতামাতা সকলেরই এন্তেকাল আছে। সকলকেই যথাসময়ে যাওয়াই ভাল ধৈর্য্যাবলম্বন আবশ্যক এবং শোকর-গোজার হওয়া উচিত। পুত্রের সম্মুখে বৃদ্ধা মাতার মৃত্যু শুভকর, মাতার সম্মুখে পুত্রের মৃত্যু কষ্টদায়ক।'[১৭] তিনি অন্য এক ভক্তকে তাঁর সুযোগ্য বড় সন্তানের মৃত্যুকথা বর্ণনা করেন এভাবে 'তিনি ছিলেন কলিকাতার Nursing Homeএ, চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। তবে মওতকে রোধ করবার কারও সাধ্য নাই। তাই বাবা অকালে ইহজগত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কলকাতার গোরস্থানে তার অন্য দুই ভাইয়ের পার্শ্বে সমাহিত করা হইয়াছে।'[১৮]

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর একটি সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম হলেও তিনি তাঁর আয়-উপার্জন ও পিতৃলব্ধ ধন প্রতিবেশীর অভাব মোচন ও জনকল্যাণার্থে অকাতরে ব্যয় করে স্বেচ্ছায় দারিদ্র বরণ করেন এবং ভক্ত-অনুসারীকে ধন-সম্পদে লালায়িত না হতে পরামর্শ দেন। তিনি মনে করেন, 'ধন মানুষকে মানুষ হতে বাধা দেয়, মুছিবত ও অভাব না হলে মানুষ তৈরী হয় না।'[১৯] তিনি এক ভক্তকে বলেন 'আমি ধনী হতে চাই না, গরীবানাই পছন্দ করি। দারিদ্রই আমার ধন ও আমার গৌরব।'[২০] অন্য এক ভক্তকে বলেন, 'বাবা খোদার কাছে কখনও অর্থ মাঙ্গবে না, মাঙ্গবে শান্তি ও তাঁর এহছান। তাঁকে পেলে সবই পাওয়া হবে, তিনি সব আনন্দের আকর।'[২১] অভাবী ও ঋণগ্রস্তদের সাহস ও উপদেশ দিয়ে লেখা হয়েছে এমনই অনেক পত্র।

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত দরদী মনের মানুষ ছিলেন। জাতপাত বিচার না করে সকল সম্প্রদায়ের, সকল ধর্মের, সকল পেশাভুক্ত মানুষদের প্রতি ছিল তাঁর সমমনের ভালোবাসা। অন্যের দুঃখ মোচনে ছিল তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা। তিনি নিজে যেমন দাতা ছিলেন, অন্যদেরকেও উৎসাহিত করতেন অভাবীকে দান করার জন্য। কিন্তু দানের স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর এক ভক্তকে বলেন, 'স্ত্রী, পুত্র, ধন, কিছুই সঙ্গে যাবে না, বরং তারাই আত্মোন্নতির অন্তরায়। দানকে অবহেলা করা উচিত নয় সত্য, কিন্তু দাতাকে ছাড়িয়া কেবল দানে মুগ্ধ থাকলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবারই কথা।'[২২] এতিমরা আল্লাহর অতি অনুগ্রহভাজনের জন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর এক ভক্তকে লেখেন, 'এতিমদিগকে ভাসাইও না, সকলকে আপনার করিয়া লও। তুমি ব্যতীত তাহাদের কে আছে? দেখিও ছিন্নপুষ্পগুলি অজ্ঞাত পদদলিত না হয়। পারিজাতের ফুল তারা, ভক্তির নজরে দেখিবে, সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করিবে, খোদার পেয়ারা হইবে।'[২৩]

স্রষ্টা-প্রেমে বিভোর এই সাধক আল্লাহকে ভালোবাসার সাথে সাথে তার সকল সৃষ্টিকে ভালোবেসেছিলেন মনের সবকিছু আবগাশ্রিত হয়ে। আর এই বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালোবাসার মাঝেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মহামহিম স্রষ্টাকে। তাইতো নিসর্গ প্রেমের মধ্যে যে আনন্দ, যে পরিতৃপ্তি, যে অচিন্তনীয় সঞ্চয়-সম্ভাবনা তা তিনি সঞ্চারণ করতে চেয়েছেন তাঁর ভক্ত ও অনুসারীদের মধ্যে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে। এক ভক্তকে লেখা পত্রে তিনি বলেন, 'যদি সময় থাকে, তবে একবার এই শৈলরাজির সঙ্গ লাভ কর, একবার প্রাকৃতিক পবিত্রতার মধ্যে স্বীয় আবিলতা ডুবাইয়া দাও, একবার পার্থিব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমময়ের সান্নিধ্য লাভ করিতে যত্নবান হও।'[২৪]

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর ভক্ত-অনুসারীদের উদ্দেশ্যে লেখা অনেক পত্রে সাংগঠনিক কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সমাজ-সংলগ্ন এই অধ্যাত্ম সাধকের ছিল অপরিসীম সাংগঠনিক ক্ষমতা। যার অন্যতম প্রধান ফসল 'আহ্ছানিয়া মিশন'। মানুষের মধ্যে আধ্যাতিক চেতনার বীজ উপ্ত করার জন্যে এবং অধ্যাত্মসাধনার সাংগঠনিক কার্যাবলী পরিচালনার লক্ষ্যে তিনি আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এক ভক্তকে লেখা পত্রে তিনি বলেন, 'নলতা গ্রামে একটি 'মিশন' অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুরুষ ও মহিলা, বালক ও যুবক, সকলেই ইহার মেম্বর হতে পারে।'[২৫] মিশনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি এক ভক্তকে বলেন এভাবে, 'দয়াময়ের রহমতের সীমা নাই। আমার বিশ্বাস এই মিশন এককালে সারা বিশ্বে বিরাজ করবে।'[২৬]

নলতায় 'আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। অবিরাম ছুটেছেন দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা মিশন প্রতিষ্ঠা ও তার উন্নয়নে। তারই ফলশ্রুতিতে/প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'হবিগঞ্জ মিশন' 'চট্রগ্রাম মিশন' 'ঢাকা মিশন' '২৪ পরগনা মিশন' প্রমুখ। এক্ষেত্রে 'চট্টগ্রাম মিশন' প্রসঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুসারী ডা. মোনায়েমকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন, 'আজকাল মিশন একদম নিদ্রিত। ইহাকে জাগাতে হবে। অন্যথা খোদার অসন্তোষ পয়দা হবে। মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য খোদার সন্তুষ্টি সাধন তাহার বান্দার মাধ্যমে। এই কর্ত্তব্য অবহেলা করিলে মহা প্রভূর নিকট দায়ী হতে হবে।'[২৭]

'আহ্ছানিয়া মিশন' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন হলেও 'সমাজ সেবা তথা সমাজ সংস্কারের সদিচ্ছা থেকে সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থাপনায় নৈতিক ও শুভ মুল্যবোধের বিস্তার ঘটাতে তিনি বেশকিছু সংগঠন ও কর্মের সূচনা করেন। যা তাঁর ভক্ত অসুসারীকে লেখা বিভিন্ন পত্র পাঠে জানা যায়। যেমন-যুবক সমিতি, সেবক সমিতি, মহিলা সমিতি, মুসলমি সেবা সমিতি, শান্তি ফৌজ, মোছলেম মিশন, সাতক্ষীরা পিপল্স এসোসিয়েশন (ঢাকা) প্রমুখ। ভক্তকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন, 'বাবা Peoples Association –এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আমি জানি তুমি একজন কর্মী যুবক--। তোমার সাথী আছেন মিঞা আবদর রহমান, তোমরাই আমার দক্ষিণ ও বাম হস্ত স্বরূপ। Association কে সজীব রাখবে, মধ্যে মধ্যে মিটিং ডাকবে।'[২৮]

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে মানুষকে মর্যাদার আসনে আসীন করার শিক্ষা দিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ভক্ত-অনুসারীকে অবস্থাভেদে শ্রদ্ধেয়, অতি প্রিয়, পরম স্নেহের, দোওয়াবরেষু, প্রাণাধিক, প্রাণপ্রতিম, মা/বাবা আমার ইত্যাদি পরিচয়ে সম্বোধন করেছেন এবং পত্রগুলিকে সুধা লিপি, দরদ-ভরা স্মৃতি, মধুর স্মৃতি, আশীর্বাদ নামা, এনায়েতনামা, মহব্বতনামা, অমিয় বাণী, আশিস্নামা, প্রমুখ নামে বিশেষায়িত করেছেন, দেখিয়েছেন ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া। তিনি তাঁর এক ভক্ত থেকে প্রাপ্ত পত্রের জবাব শুরু করেন এভাবে, 'প্রাণপ্রতিম বাবা, প্রেমের বান কিশোরগঞ্জ হ'তে এসে এখানকার ক্ষুদ্র আত্মাগুলিকে ভাসিয়ে দিয়েছে। মনে হয় বেহেশতের নূর প্রেমলিপি মাথায় করে ছুটে এসেছে সোহাগ জানাতে। পত্র পড়লে ভাষা ভুলে যাই, ভাবের ঝঙ্ককারে।'[২৯]

'আমি ত বেকার ব্যক্তি, দুনিয়ার জঞ্জাল স্বরূপ, কাহারও কোনো কাজে আসিতে পারি না।'[৩০] 'আমি দুনিয়াতে এসেছি খেদমত করতে, খেদমত নিতে নয়, আমি বাবা তোমাদেরই খাদেম, আমাকে আদেশ করবে, কিরূপে আমি তাহা পূরণ করতে পারি!'[৩১] এমনি অনেক বিনয়ের বাণী দেখা গেছে তাঁর বিভিন্ন পত্র, এমনকি প্রত্যেকটি পত্রে এবং এভাবেই তিনি নিজেকে ক্ষুদ্রতম মনে করার শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর ভক্ত-অনুসারীদেরকে। এছাড়াও তিনি প্রতিটি চিঠি শেষ করেছেন 'কীটাণুকীট', 'জনৈক দাসানুদাস', 'দীনাতিদীন' 'অধমাধম' 'জনৈক পরিত্যাক্ত', 'নিকৃষ্টতম', 'জনৈক বিভ্রান্ত' 'সারা দুনিয়ার পদরেণু' 'নাচীজ' 'কাঙ্গাল' 'হকীর' 'খাকছার' 'নালায়েক'–এমনি ধরনের আত্মবিশেষায়িত পরিচিতি দিয়ে।

'পত্র যোগাযোগ কেবল তার বিশ্বাস ও উপলব্দির বহিঃপ্রকাশ ছিল না, এ যেন ছিল জীবন-ধর্ম ও কঠিন-কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার আরেক নাম। তাইতো পীড়িত অবস্থাতেও ভক্তজনের পত্রের জবাব দিতে না পারলে তিনি অশান্তি বোধ করেন।'[৩২] এক্ষেত্রে ভক্তকে লেখা এক পত্রে তাঁর হৃদয়ভাব প্রকাশ পেয়েছে এভাবে, 'আমি পীড়াভারে ক্লান্ত, লিখিবার শক্তি কোথায়? তবু যে-লিপি সত্য জগতের আভাস দেয়, তাহার উত্তর না দিলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। তাই ভাঙা প্রাণের ভাঙা কথা লইয়া হাজিরি দিতে অগ্রসর হই।'[৩৩]

পত্র যোগাযোগ ছিল হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর ভালোলাগার একটি অংশ। জানা যায়, যখন তিনি বয়সের ভারে অনেকখানি ক্লান্ত, চোখে কম দেখেন, তখনও দৈনিক ১০/২০ বা ততোধিক পত্রের জবাব দিতেন। একবার অসুস্থ থাকাকালীন কোনো এক সুহৃদ তাঁকে উক্ত সময়ে পত্রলেখা থেকে বিরত থাকতে বললে তিনি ঐ সুহৃদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে লেখা এক পত্রে জবাব দেন এভাবে, 'প্রহলাদকে তাহার পিতা হরিনাম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বালক প্রহলাদ নিষেধ শুনেন নাই; তাই তাহাকে সমুদ্র

বক্ষে নিপাতিত করা হইয়াছিল, পর্ব্বত চূড়া হইতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, অগ্নিকুন্ডে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু হরিনাম ত্যাগ করে নাই। জীবনের মূল্য বেশী, না হরিনামের মূল্য বেশী। মস্তিষ্কের মূল্য বেশী, না মঙ্গলময়ের কীর্ত্তনের মূল্য বেশী?[৩৪]

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র লেখা পত্রগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশকালে 'ভক্তের পত্র'র 'নিবেদন' অংশে লেখক বলেন, 'আত্মিক আনন্দ এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার অংশলাভে উৎসুক অনেক আত্মা পৃথিবীতে আছে, তাই লেখক পত্রগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছে। যদি একটি পিপাসিত আত্মাও ইহা হইতে বিন্দু পরিমাণ রস আহরণ করিতে সমর্থ হয়, তবেই লেখকের সকল শ্রম সার্থক হইবে।'[৩৫] এছাড়া 'প্রেমিকের পত্রাবলী'র নিবেদন অংশে তিনি লেখেন 'ইহা দ্বারা প্রেমিকবর্গের চিন্তাধারা মাহ্বুবের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হইবে।'[৩৬]

মানবজীবনের আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়ে তাঁর ভক্তদের কাছে লেখা চিঠির সমন্বয় ঘটেছে উল্লেখিত গ্রন্থগুলাতে। যার সবগুলো আমরা মানবজীবনের আদর্শ দিকনির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তাই লেখকের শ্রম শুধু সার্থকই নয়, তাঁর চিঠিপত্র সম্বলিত উক্ত গ্রন্থ দুটিসহ সকল গ্রন্থ আমাদের জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় মহামূল্য সম্পদ হয়ে বেঁচে আছে, থাকবে তাঁর ভাবাদর্শী মানবের জন্য যুগ-যুগান্তর ধরে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা: নির্বাচিতপত্র: [১] পৃষ্ঠা-৩, [২] পৃষ্ঠা-৫ ও ৮, [৩২] পৃষ্ঠা-৫।

২। ভক্তের পত্র: [৩] পত্র সংখ্যা-১৬০, [৬] পত্র সংখ্যা-১৫০, [৮] পত্র সংখ্যা-১৪৮, [১০] পত্র সংখ্যা-২১৫, [১২] পত্র সংখ্যা-১৮২, [১৩] পত্র সংখ্যা-১০, [১৪] পত্র সংখ্যা-২২৯, [১৫] পত্র সংখ্যা-৫২, [১৭] পত্র সংখ্যা-১১৫, [২৩] পত্র সংখ্যা-১০৩, [২৪] পত্র সংখ্যা-১৪, [২৫] পত্র সংখ্যা-২০৮, [৩৩] পত্র সংখ্যা-৯১, [৩৪] পত্র সংখ্যা-৭১, [৩৫] নিবেদন অংশ।

৩। প্রেমিকের পত্রাবলী: [৪] পত্র সংখ্যা-২, [৭] পত্র সংখ্যা-১২৯, [৯] পত্র সংখ্যা-৬০ [১১] পত্র সংখ্যা-১০২, [১৯] পত্র সংখ্যা-১০৪, [২১] পত্র সংখ্যা- ৫৯, [২২] পত্র সংখ্যা-৭০, [৩০] পত্র সংখ্যা-১২, [৩১] পত্র সংখ্যা-২৭, [৩৬] নিবেদন অংশ।

৪। অপ্রকাশিত রচনাবলী: [৫] পত্র সংখ্যা-৮৭৫, [১৬] পত্র সংখ্যা-১২৩, [১৮] পত্র সংখ্যা-৬২০, [২০] পত্র সংখ্যা-২৬৯, [২৬] পত্র সংখ্যা-৯৬৫, [২৮] পত্র সংখ্যা-৭৬৬, [২৯] পত্র সংখ্যা-৪৭০, [২৮] পত্র সংখ্যা-৭৬৬, [২৮] পত্র সংখ্যা-৭৬৬।

মোঃ আনছার আলী ফকির
উপ-পরিচালক (আইএইউ), ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আ. শ. ম. বাবর আলী
কনসালটেন্ট (প্রকাশনা), ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন